ওজোন ছিদ্র কি ?!

রচনা : হায়ানন
অনুবাদ : রজত আচার্য্য

ওজোন স্তর সংক্রান্ত গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

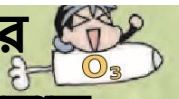

পৃথিবীর সমস্ত ওজোনের ৯০% পাওয়া যায় স্ট্রাটোসফেয়ার-এ | এবার স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা যাক, কে এটি আবিষ্কার করেন এবং কিভাবে। সূর্যের আলো বিভিন্ন ধরণের তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের সমন্বয়ে তৈরি। এতে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে শুরু করে রয়েছে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মি পর্যন্ত। তোমাদের কি মনে হয়, এটা কোনো কঠিন বিষয়? তাহলে একটা রামধনু বা প্রিজমের কথা মনে করো। রামধনুতে বিভিন্ন রং তোমরা দেখতে পাও, যার মানে সূর্যের আলোয় বিভিন্ন আলোক তরঙ্গ রয়েছে।

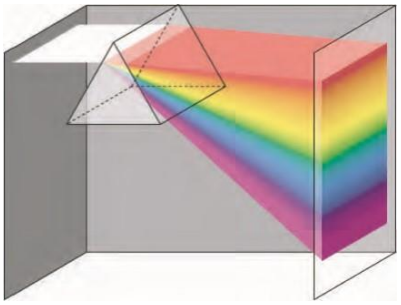

যখন সূর্যের আলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন তা বিভিন্ন রঙের আলোক রশ্মিতে ভেঙে যায়।

১৮৮১ সালে, এক আইরিশ রসায়নবিদ, ডব্লিউ. এন. হার্টলে দেখলেন যে ওজোন, ২০০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। ১৫ বছর পরে, এক ইংরেজ মহাকাশবিদ ডব্লিউ. হাগ্গিন্স সিরিয়স তারার বর্ণালী অধ্যয়ন করার সময় আবিষ্কার করলেন যে, ওজোন ৩০০ থেকে ৩৪০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মিও শোষণ করে। হার্টলে প্রশ্ন তুললেন, কেন পৃথিবীতে পৌঁছানো সূর্যের আলোয় অতিবেগুনি রশ্মি পাওয়া যায় না, যদিও ঠিক সূর্য থেকে বিকিরণের পর সেই আলোয় অতিবেগুনি রশ্মি বর্তমান থাকে ? উনি অনুমান করলেন যে পৃথিবীর উপরে প্রচুর পরিমানে ওজোন রয়েছে, যা সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয় । এই অনুমান প্রতিপন্ন করার জন্য বেলুনের সাহায্যে এক পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু এই বেলুন ওজোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে অপারগ হয়।

১ ন্যানোমিটার হলো ১ মিটারের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ

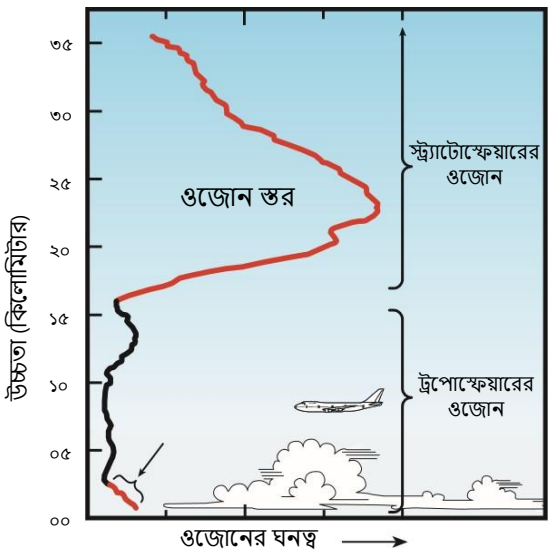

ওজোন স্তর ১৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার উচ্চতায় থাকে, যদিও এই উচ্চতা অক্ষাংশের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

শেষে, ১৯৪০ সালে, রকেট দ্বারা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে ওজোনের উপস্থিতি প্রতিপন্ন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হার্টলে সেই কথা জেনে যেতে পারেননি। এর পর ওজোনের উৎস ও বিন্যাসের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য প্রচুর গবেষণা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষের অঙ্গ হিসাবে, ১৯৫৭ সালে এন্টার্টিকায় ওজোনের পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। সেই সময়, কেউই ভাবেননি যে এই পর্যবেক্ষন থেকেই ওজোন ছিদ্রের উপস্থিতি আবিষ্কৃত হবে।

এই গবেষণার অগ্রগতি থেকে ক্রমশ মানুষ জানতে পারে যে, পৃথিবীতে জীব ও উদ্ভিদ জগৎ এই ওজোন দ্বারা সুরক্ষিত, যা ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। আজকের এই গবেষণার সাফল্যের পিছনে রয়েছে হার্টলের মতন বিজ্ঞানীদের অর্জিত সাফল্য, যিনি প্রথম ওজোনের রাসায়নিক অধ্যয়ন করেন। আমরা আশা করবো,আপনারা মোল আর মিরুবোর সঙ্গে ওজোন স্তরে এই অভিযান উপভোগ করবেন।

এরা হলো বিজ্ঞান প্রেমী মোল
আর তার রোবট কুকুর মিরুবো।
এক সুন্দর উষ্ম দিনে এক খোলা মাঠে শুয়ে এরা আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে চেয়ে আছে।
ওই মেঘগুলোর ওপরে কি আছে বলে তোর মনে হয় রে, মিরুবো?
মেঘের ওপরে? হমমম।
ওর ওপরে নিশ্চই আকাশ আছে।

তোর মাথায় কি সামান্য কল্পনা বলেও কোনো জিনিস নেই রে?
আমি ভেবেছিলাম তুই আমাকে আরো আকর্ষক কিছু বলবি।
ওর এই বয়সটাই এরকম।
কে বললে আমার কল্পনা নেই। কতই না ভালো হতো যদি ওই মেঘের ওপরে থাকতো সুস্বাদু খাবারের অনেক দোকান।
দাড়াও, এবার আমার মনে পড়েছে।
ওই মেঘের অনেক ওপরে আছে ....
ওজোন স্তর।
আমি এটা আগে শুনেছি।
ওজোন স্তর ?
সেটা কি ?

শিক্ষক মশায়, ওজোন কি সেটা আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?
নিশ্চই। এটাই আমার বিষয়।
এবার, মোল আর মিরুবো আমায় বলো, ...
তোমরা ওজোন সম্পর্কে কতটা জানো?
ওহমম
অক্সিজেন সম্পর্কে কিছু জানো কি?
ওহ, আমি জানি। আমি সারাদিনে অনেক অনেক অক্সিজেন নিই।
নিশ্বাস
ওজোন আছে আমাদের থেকে অনেক অনেক ওপরে...
এই ওজোন আসলে অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি।
বাহ্!

যখন কোনো অক্সিজেন অণু (O_2), অতিবেগুনি রশ্মি দ্বারা তাড়িত হয়...
তখন সেই অনু ভেঙে তৈরি হয় দুটি অক্সিজেন পরমাণু।
তারপর একটা অক্সিজেন পরমাণু একটা অক্সিজেন অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।
এইভাবে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে গঠন করে একটি ওজোন অণু।
যেই স্থানে এই ওজোন অণুগুলো কেন্দ্রীভূত হয়, তাকে বলে....
ওজোন স্তর।
সূর্য থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আসে, তা পৃথিবীতে প্রানধারণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক
এই ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মির প্রায়াংশ শোষণ করে নেয়।
ঠিক এক সুরক্ষা কবচের মতো, এই ওজোন স্তর পৃথিবীকে আগলে রেখেছে।
এই ওজোন স্তর না থাকলে...
পৃথিবীকে কোনো প্রাণ থাকতো না।

আ হ হ হ !!
অতিবেগুনি রশ্মি তো মারাত্মক
শান্ত হও। আমাদেরকে ওজোন স্তর সুরক্ষা দিচ্ছে।
চিন্তার কিচ্ছু নেই
হিপ হিপ হুররে
তোমাদের বলি, চিন্তার কারণ তো রয়েছে।
কিইইই?
১৯৮০ সালে, বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এন্টার্টিকার উপর থেকে ওজোন স্তর হারিয়ে যাচ্ছে।
আর সেই কারণে ওজোন স্তরে যেন ঠিক একটা ছিদ্র হয়েছে, এমন . . দেখাচ্ছে।
এন্টার্টিকা
সেই কারণে অনেক বেশি অতিবেগুনি রশ্মি সেই ছিদ্র দিয়ে চলে আসছে।
এতো এক মস্ত সংকট।
দাড়াও।
ওজোন স্তরে ছিদ্র তো এন্টার্টিকার উপর। অন্য কোথাও নেই।
আমরা তাহলে নিরাপদ জায়গায় আছি।
বাঁচা গেলো
কিন্তু তাহলে পেঙ্গুইনদের কি হবে? ওরা তো মুশকিলে পড়বে।
তুমি কি সত্যিই ওদের জন্য ভাবছো?

এন্টার্টিকার উপর ওজোন ছিদ্র তৈরি হয়েছে বলে আমরা নিরাপদ, একথা বলা চলে না।
এর প্রভাব আমাদের ওপরেও পড়বে, তা আমরা যেখানেই থাকি না কেন।।
বাস্তবিক ভাবে, এক অনুরূপ ঘটনা আর্কটিক অঞ্চলেও দেখা গেছে।
সেখানে বসবাসকারীদের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।
ওজোন স্তর-এ ছিদ্র কিজন্য তৈরি হয়?
কিভাবেই বা তৈরি হয়?
সি এফ সি
যার অর্থ কিনা ক্লোরো-ফ্লুওরো কার্বন। এরাই ওজোন স্তর-এ ছিদ্র তৈরি করে।
প্রায় দশ বছর আগে পর্যন্ত সি এফ সি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো . . .
ফ্রিজ এ.সি. আর আর স্প্রে ক্যান-এ

এখন আমরা জানি যে আমাদের দৈনন্দিন কাজে নিঃসৃত সি.এফ .সি. বাতাসের সঙ্গে বয়ে গিয়ে পৌঁছে যায় স্ট্রাটোসফেয়ারে।
স্ট্রাটোসফেয়ারে পৌঁছে তারা ধ্বংস করে ওজোন স্তরকে!

গবেষণার ফল প্রকাশিত হতে, সি.এফ.সি. ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেলো।
কিন্তু মানুষের ব্যবহারের জন্য ফ্রিজ, এ.সি., ইত্যাদি জিনিস তো চাই ই।

তখন এই সব যন্ত্রে
সি.এফ.সি.র বিকল্প ব্যবহার হতে লাগলো।

কিন্তু মানুষ সি.এফ.সি. পরিত্যাগ করার সাথে সাথেই যে ওজোন ক্ষয় বন্ধ হবে, এ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।
ঠিক কথা।
সি.এফ.সি. অত্যন্ত স্থিতিশীল যৌগ আর তাই তা বিনষ্ট হতে অনেক সময় লাগে।

ওহ :, তাহলে কতদিনে এই ওজোন ছিদ্র পুরোপুরি ঢেকে যাবে?
নাকি তা আর কোনোদিনও হবে না?
সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গেছে যে, এই ওজোন ছিদ্র পুরোপুরি বন্ধ হতে লাগবে ৫০ বছর।
৫০ বছর?! এতো সময় লাগবে?!
হাঁ, আর ততদিন পর্যন্ত এই ওজোন ছিদ্র বিদ্যমান থাকবে|
খুব খারাপ ব্যাপার|
তাহলে কি, এই ওজোন স্তর সম্পূর্ণ রূপে ঠিক হবার জন্য, আমরা শুধু অপেক্ষাই করতে পারি ?

এই ছিদ্র বন্ধ করার আর কোনো উপায় আমাদের কাছে আছে কি?
হ্যাঁ।
সেলাই করে?
আমার মাথায় একটা দারুন বুদ্ধি এসেছে।
আকাশে ওজোন ছড়িয়ে দিলে কেমন হয়?
নিশ্চয় এতে কাজ হবে।
O3
উ ম ম,
আমি দুঃখিত, কিন্তু এমন করা সম্ভব নয়।
ওঃ, কেন নয়?
পৃথিবীর পুরো ওজোনের ৯০% স্ট্রাটোসফেয়ার এ রয়েছে ... আর বাকি ১০% রয়েছে ট্রপোসফেয়ারে।
90%
10%
ট্রপোসফেয়ারে থাকা ওজোন, যা আমাদের আরো কাছাকাছি আছে, তা আসলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
স্ট্রাটোসফেয়ার এ ওজোন অবশ্যই আমাদের রক্ষা করছে।
কিন্তু ওজোন নিজে মারাত্মক বিষাক্ত।
কি ই ই!!

জীব জীবনে তার প্রভাব নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। তাছাড়া একে বৈশ্বিক - উষ্ণায়নের একটি কারণ বলেও মনে করা হচ্ছে।
ট্রপোসফেয়ারে ওজোনের পরিমান যত বাড়বে , পৃথিবী থেকে মহাকাশে নিষ্কৃত শক্তির তত বেশি অংশ এখানে শোষিত হবে।
ওজোন তাহলে খারাপ ? !
উ ম ম ম
ওজোনের স্বভাব ঠিক ড: জেকিল আর মি: হাইডের মতো।
বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোনের পরিমান হ্রাস হাওয়া একটি সমস্যা।
আবার, নীচভাগে তার বৃদ্ধিও এক সমস্যা|
কি অদ্ভুত, তাই না?
এবং দুটি সমস্যাই সঙ্কটজনক।
সি.এফ.সি. ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণের প্রণয়ন করা হয়েছে স্ট্রাটোসফেয়ার এ ওজোন হ্রাস সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য।
ওপর দিকে যানবাহন ও কলকারখানা থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে,
কারণ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ট্রপোসফেয়ারে ওজোন তৈরি করে।

ট্রপোসফেয়ার ও স্ট্রাটোসফেয়ারের ওজোন নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হচ্ছে,
যাতে এই অবস্থার আরো অবনতি না হয়।
আমি আগে কখনো বুঝিনি যে ওই মেঘের উপর থাকা ওজোন স্তর আমাদের পৃথিবীকে নিরাপদ রাখে।
আমি ভেবে মুগ্ধ হচ্ছি
কত ভালো হবে যদি ১০০ বছর পর মানুষ বলে যে, "অনেক দিন আগে ওজোন স্তরে একটা ছিদ্র ছিল "
নিশ্চই !
আমি আশা করবো তেমনটাই হবে।
পরিবর্তে আমাদেরকেও এই ওজোন স্তরকে রক্ষা করতে হবে।
ঠিক।
এসো, আমরা ভাবি এর জন্য আমরা কি করতে পারি।

ওজোন ছিদ্র কি ?!

নমস্কার শিক্ষক মশায়। কিছুদিন আগে আমি ওজোন ছিদ্র সম্পর্কে এক প্রতিবেদন পড়লাম। এটা কি সত্যি, যে ওজোন মানুষ, প্রাণী আর উদ্ভিদদের রক্ষা করছে ?

হ্যাঁ। ওজোন স্তর পৃথিবীকে চার দিক থেকে ঘিরে আছে আর সূর্যের অতিবেগুনি রাশি থেকে আমাদের রক্ষা করছে।

আমার মতো উচ্চ প্রযুক্তির রোবটের কাছে, অতিবেগুনি রশ্মি তো কিছুই নয়।

বেশ। তোমাদের ধারণা অনুযায়ী, এই ওজোন স্তর কত পুরোনো হতে পারে ?

ভেবে দেখি..... আমার মনে হয় পৃথিবীতে মানুষ আসার অনেক আগেই এখানে ওজোন স্তর তৈরি হয়েছে।

পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিল ৪৬০০ কোটি বছর আগে। আর, ওজোন স্তর ৪০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

২৫ থেকে ৬.৫ কোটি বছর আগের ডাইনোসরদের যুগের আগেই এই ওজোন স্তর সৃষ্টি হয়েছিল। আসলে, ওজোন স্তর তৈরি হয়েছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে, কয়েকশো কোটি বছর ধরে।

ঠিক বলেছো। এই ওজোন স্তরের জন্যই পৃথিবীতে জীবন ধারণ সম্ভব হয়েছিল। ওজোন স্তর না থাকলে পৃথিবী হতো প্রাণহীন। মিরুবো, তুমিও এর ব্যতিক্রম নও।

ওজোন স্তরের ওজোনের মাত্রা যদি কমে যায়, তাহলে কি হবে ?

অতিবেগুনি রশ্মি আরো বেশিমাত্রায় পৃথিবীতে আসবে এবং তা উদ্ভিদ ও জীবজগতের ক্ষতি সাধন করবে।

অতিবেগুনি রশ্মির কারণে জীব ও উদ্ভিদদের দগ্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা জীবন্ত দগ্ধ হতে পারি, মোল।

না আ আ আ

এর থেকেও খারাপ হতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের কোষের ডি.এন.এ কে ধংস করে এবং ত্বকের ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়। এও দেখা গেছে যে, অত্যধিক অতিবেগুনি রশ্মিতে চোখের লেন্সের প্রোটিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার থেকে চোখে ছানি পড়তে পারে। এর ফলে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

আমি ওজোন স্তর নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ছি। ওজোন স্তর তো এতো উচ্চতায় রয়েছে, এর পরিমাপ কি করে করা হয়?

আপনাদের কি কোনো ভিনগ্রহের বাসিন্দার সঙ্গে পরিচিতি আছে যারা ইউ.এফ.ও থেকে মেপে দিয়ে যায়?

একদম ঠিক তা না হলেও, প্রায় সেইরকমই কিছু করা হয়?

তাই নাকি, আমি তো মস্করা করছিলাম।

আমাদের স্যাটেলাইট মহাকাশ থেকে ওজোন স্তরের পর্যবেক্ষণ করছে। তারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে আর বিভিন্ন দেশের উপর ওজোনের জরিপ করছে।

আর অন্য কোনো উপায় নেই ?

হ্যাঁ, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পর্যবেক্ষণের দ্বারা ওজোনের স্থিতি বোঝা যায়, এমনকি বেশি উচ্চতাতেও। লেসার রাডার বা অন্য কোনো উপায়ে ওজোন দ্বারা নিঃসৃত রেডিও তরঙ্গ সনাক্ত করা হয়। মহাকাশে পাঠানো যন্ত্রের থেকে পৃথিবীর উপর থাকা যন্ত্রের যান্ত্রিক ত্রুটি সহজেই সরানো যায়।

আমি বুঝেছি, মহাকাশে একটা যন্ত্র সারানোর দোকান খুলতে হবে, স্যাটেলাইট আর আমার জন্য। এটা থাকলে, মহাকাশ যাত্রার সময় আমি অনেক নিশ্চিন্তে যেতে পারবো।

তুই চুপ কর, মিরুবো।

ওজোন নিয়ে এক মজাদার পরীক্ষা

আশাকরি মূল আর মিরুবর বৈজ্ঞানিক অভিযান, তোমাদের ভালো লেগেছে। বর্তমানে আমরা ওজোন নিয়ে দুটি সমস্যার সম্মুখীন। প্রথমটি হলো, স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে ওজোনের হ্রাস এবং তার কারণে তৈরি ওজোন ছিদ্র। অন্যটি হলো, ট্রপোস্ফেয়ারে ওজোনের বৃদ্ধি, যা আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার একটি উপকরণ। এবার আমরা একটা মজাদার পরীক্ষা করবো, যার দ্বারা আমরা ওজোন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো।

এই পরীক্ষার জন্য চাই, একটি কমলা লেবু, যা যেকোনো ফলের দোকানে পাওয়া যাবে, আর একটি কাঁচের ফ্লাস্ক, যা তোমরা তোমাদের ইস্কুলের পরীক্ষাগারে দেখেছো। দুটি উপকরণই একদম সাধারণ জিনিস। প্রথমে কমলা লেবুটিকে ছাড়িয়ে খোসার সামান্য অংশ ফ্লাস্কে রাখো। এই অবস্থায় প্রথম ছবিটি নেওয়া হয়েছে। তোমরা বলবে, কিছুই তো পরিবর্তন হলো না। দাড়াও, ধৈর্য ধরো ! প্রায় ৩০ সেকেন্ড পর, বিকারে দেখা যাবে সাদা ধোয়া (২য় ছবিটি দেখো) !! তাহলে ফ্লাস্কে কি ঘটলো, কি কারণে এই সাদা ধোঁয়া তৈরি হলো ?

ছবি-১ : কমলালেবুর খোসা ফ্লাস্কে রেখে ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষা করো।

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে, আমি আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার বিষয়ে কিছু বলবো। তোমরা কেউ কি দেখেছো, কেমন দূরের পাহাড় চূড়াগুলি সাদা বা বাদামি রঙের কুয়াশায় ঢাকা থাকে? এই কুয়াশার মতো আচ্ছাদন, যা বড় বড় শহরে খুব বেশি দেখা যায়, আসলে ধোঁয়াশা (৩য় ছবিটি দেখো) । এই ধোঁয়াশা, ঘন্টায় ঘন্টায় তার রং ও ঘনত্ব পরিবর্তন করে । এবং এই পরিবর্তনের হার দিনের সময় এবং বছরের মাস অনুযায়ী বদলাতে থাকে। সূর্যালোকের তীব্রতা, বাতাসের গতিবেগ, ইত্যাদি আবহাওয়ার অবস্থা, এই ধোঁয়াশার উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।

ছবি-২ : আগুন ছাড়াই ধোঁয়া তৈরি হয়েছে।

শিল্প ও যানবাহন দ্বারা নিঃসৃত নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোকার্বোন এবং ওজোন দ্বারা এই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয় । হাইড্রোকার্বোন এবং ওজোনের মধ্যে এক জটিল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এই ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে থাকে অত্যন্ত ছোট ছোট কণা, যা আলোককে বিচ্ছুরিত করে। এই কারণে দূরের বস্তুর দৃশ্যমানতা হ্রাস পায়। এই ধোঁয়াশার কারণে চোখ ও গলায় জ্বালা অনুভব হতে পারে। বস্তুত, এই ধোঁয়াশা সকল জীব ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

এবার কাজের কথায় ফিরে আসা যাক। এই মজাদার পরীক্ষায় কোনো কারসাজি নেই । আসলে, আমি আগে থেকেই এই ফ্লাস্কে কিছুটা ওজোন ভোরে রেখেছিলাম। ওজোন যেহেতু বর্ণহীন, তাই ফ্লাস্কে একে দেখা যায় নি। কমলালেবুর খোসা থেকে লিমোনিন নামক এক হাইড্রোকার্বোন নিঃসৃত হয়। কমলা লেবু খাওয়ার সময়, এই লিমিনিনেরই এক উদ্দীপক গন্ধ আমরা পেয়ে থাকি। লিমোনিন ও ওজোনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ফ্লাস্কের মধ্যে ওই ধোঁয়া তৈরি হয়েছিল । এই উপায়েই বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

ছবি-৩ : সিয়াটেল-এর ধোঁয়াশা। এক বাদামি ধোঁয়াশা দিগন্তের চারপাশে চেয়ে রয়েছে।

বাস্তবে, শিল্প ও যানবাহন থেকে হাইড্রোকার্বোন নিঃসৃত হয় যা ওজোনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। সারা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক মহল এই প্রক্রিয়াকে বিশদে বুঝতে চেষ্টা করছে।

সতর্কীকরণ: এই পরীক্ষা বিপজ্জনক হতে পারে। সঠিক তত্ত্বাবধান ছাড়া এই পরীক্ষা নিজে করা নিষেধ ।

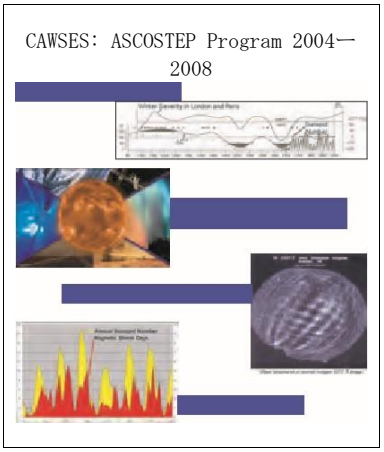

সূর্য ও পৃথিবীর সম্মিলিত তন্ত্রের আবহাওয়া ও জলবায়ু (CAWSES)

CAWSES হলো SCOSTEP প্রযোজিত একটি আন্তর্জাতিক কার্যক্রম| মহাকাশ ও তার পরিবেশ এবং আমাদের জীবন ও সমাজে তার প্রভাবের ব্যাপারে আমাদের বোধ উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে এটি স্থাপিত হয়| CAWSES এর প্রধান কার্যাবলী হলো, এই বোধ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষন, মডেল তৈরি ও তত্ব গঠনে আন্তর্জাতিক কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য করা| সেই সঙ্গে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের এই কাজে বিজড়িত করা ও সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা| CAWSES এর কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন, ম্যাসাচুসেটস-এ অবস্থিত বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে| CAWSES এর বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি মূল প্রসঙ্গ ছবিতে দেখানো আছে|

http://www.bu.edu/cawses/

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html

সোলার টেরেস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট ল্যাবরেটরি (STEL) নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়

জাপানে STEL পরিচালিত হয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় পদ্ধতি দ্বারা| এর উদ্দেশ্য, জাপানে এবং অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, সৌর-ভৌম তন্ত্রের গঠন ও পরিবর্তনের উপর গবেষণাকে আরো উন্নীত করা | এই গবেষণাগার চারটি বিভাগে ভাগ করা: বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ, আয়োনোস্ফেরিক ও চৌম্বকীয় পরিবেশ, হেলিওস্ফেরিক পরিবেশ এবং সমন্বিত পঠন বিভাগ | জিওস্পেস রিসার্চ সেন্টারও, যৌথ গবেষণা প্রকল্পগুলি সমন্বয় ও উন্নীত করার উদ্দেশ্যে, এই গবেষণাগারের সঙ্গে সংসৃষ্ট | দেশব্যাপী বিন্যস্ত এর সাতটি মানমন্দির / পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে, বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক সত্ত্বার, ভুস্থলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করা হয় |

http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

はやのん

হায়ানন : রিওক্যু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হায়ানন একযোগে এক লেখক ও কার্টুনিস্ট | বিজ্ঞান ও কম্পিউটার-গেমস এ তার গভীর ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রচুর ধারাবাহিক-এ তার অবদান রেখেছেন | তার সামঞ্জস্যপূর্ণ লিখনি শৈলীতে প্রত্যক্ষিত তার বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা আজ সর্বজনবিদিত |

http://www.hayanon.jp/

子供の科学

কোডোমো নো কাগাকু (ছোটদের জন্য বিজ্ঞান) : সেইবুন্দ শিনকশা প্রকাশনা সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত, কোডোমো নো কাগাকু, ছোটদের জন্য প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা | ১৯২৪ সালে প্রকাশিত এর প্রথম সংস্করণের থেকেই এই পত্রিকাটি বিজ্ঞান শিক্ষার পরিষেবায় নিয়োজিত | এই পত্রিকায়, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানভিত্তিক ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম গবেষণা বিষয়, ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় |

http://www.seibundo.net/